ইউনিট ১
দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা

ইউনিট ১ দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা

দেশের মাটিতে দেশীয় ব্যক্তিবর্গ দ্বারা পরিকল্পিত, প্রতিষ্ঠিত, পরিচালিত ও লালিত শিক্ষা ব্যবস্থাকেই দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা বলা হয়। মোগল শাসনের অবসানের পর, এমন কি ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষের শাসন লাভের পরেও দীর্ঘ দিন ধরে প্রচলিত ধারা অনুযায়ী এদেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা চালু ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকে এদেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নয়নের চেষ্টা করা হয়। এ জন্য তৎকালীন সময়ে প্রচলিত দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কীয় তথ্যের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কোম্পানীর কোর্ট অব ডাইরেকটরস কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে ১৮২৬ সালের মার্চ মাসে মাদ্রাজ প্রদেশের গর্ভণর স্যার টমাস মুনরো এবং ১৮২৯ সালের বোম্বে প্রদেশের গর্ভণর মিঃ এলফিনস্টোন নিজ নিজ প্রদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে সরকারীভাবে যে রিপোর্ট পেশ করেন তা অসম্পূর্ণ ছিল। এ জন্য তা নির্ভরযোগ্যও ছিল না। তৎকালীন ভারতের বড় লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক কর্তৃক নিযুক্ত হয়ে স্কটল্যান্ডবাসী মিশনারী উইলিয়াম এ্যাডাম বাংলা ও বিহারের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে ব্যাপক অনুসন্ধান চালিয়ে ১৮৩৫–৩৮ সালে বেসরকারীভাবে ৩টি রিপোর্ট পেশ করেন। তাঁর রিপোর্ট অনেক ক্ষেত্রে ত্রুটিপূর্ণ হলেও অনেকটা নির্ভরযোগ্য ছিল। তাঁর রিপোর্ট থেকে তৎকালীন ভারতবর্ষের দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থার যে মোটামুটি চিত্র পাওয়া যায় বর্তমান ইউনিটে এ বিষয়ে জানার চেষ্টা করা হয়েছে।

পাঠ ১.১ দেশীয় শিক্ষার স্বরূপ

এ পাঠ শেষে আপনি –

- ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে প্রচলিত দেশীয় শিক্ষার পরিসংখ্যান বলতে পারবেন।
- দেশীয় প্রাথমিক ও উচ্চ শিক্ষার বিবরণ দিতে পারবেন।
- জাতীয় শিক্ষার বুনিয়াদ তৈরিতে দেশীয় শিক্ষার ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

মুনরো, এলফিনস্টোন, উইলিয়াম এ্যাডাম প্রমুখ মনীষীর রিপোর্ট প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এদেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থার যে চিত্র পাওয়া যায় তা সংক্ষেপে নিম্নে প্রদত্ত করা হলো–

১। শিক্ষার পরিসংখ্যান

এড্যামের রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলা বিহারে ১ লক্ষ বিদ্যালয় ছিল। এ হিসেবে সমগ্র ভারতবর্ষে দেশীয় বিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রায় ১০ লক্ষ ছিল বলে অনুমান করা হয়। প্রতি ৪০০ জনের জন্য একটি ছিল। প্রায় প্রতি গ্রামেই বিদ্যালয় ছিল। ৫ হতে ১৪ বছরের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে প্রতি ৬৩ জনের একটি বিদ্যালয় ছিল। উক্ত বয়সের ছেলেদের ৭% বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করতো। শুধু পুরুষের শিক্ষিতের হার ছিল স্থান বিশেষ ৮% হতে ১২% এবং পুরুষ ও মহিলা ধরে শিক্ষিতের হার ছিল ৪% হতে ৬%।

২। দেশীয় বিদ্যালয়ের শ্রেণী বিভাগ

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারতবর্ষে শিক্ষা পরিবেশক সংস্থাগুলেকে মোট সাতটি স্তরে ভাগ করা যায়। যেমন– (১) দেশীয় প্রাথমিক বিদ্যালয় (২) মিশনারী ও অন্যদের দ্বারা পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয় (৩) পারিবারিক বিদ্যালয় (৪) ইংরেজী বিদ্যালয় ও কলেজ (৫) দেশীয় বালিকা বিদ্যালয় (৬) দেশীয় শিক্ষা বিদ্যালয় ও (৭) বয়স্ক শিক্ষার প্রতিষ্ঠান।

উক্ত সাতটি স্তরের মধ্যে দেশীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো মোটামুটি দুই শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। যথা– (১) দেশীয় প্রাথমিক বিদ্যালয় ও (২) দেশীয় উচ্চ শিক্ষার বিদ্যালয়, দেশীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো দুই রকমের ছিল। যেমন– (১) ফরাসী ভাষার বিদ্যালয় ও (২) আধুনিক ভারতীয় ভাষার বিদ্যালয়।

উচ্চ শিক্ষার বিদ্যালয়গুলো আবার দু'রকম ছিল। যথা– (১) টোল (হিন্দুদের), (২) মাদ্রাসা (মুসলমানদের)।

সংক্ষেপে দেশীয়, বিদ্যালয়ের শ্রেণিভাগ নিম্নরূপঃ

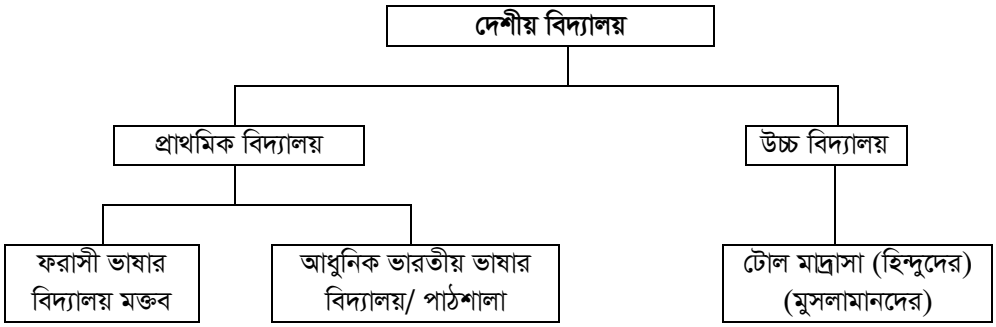

তা'ছাড়া ভারতের সর্বত্র গৃহ বিদ্যালয়ের (Domestic School) প্রচলন ছিল নিজ গৃহে পিতা, পিতামহ, জৈষ্ঠ্যভ্রাতা বা গৃহ শিক্ষক শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদান করতেন।

৩। প্রাথমিক শিক্ষা

ক) দেশীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো জনশিক্ষার প্রধান কেন্দ্র ছিল। গ্রামের সাধারণ জমিদার, ব্যবসায়ী ও অবস্থা সম্পন্ন ব্যক্তিদের চাহিদা ও প্রয়োজনকে কেন্দ্র করে এসব বিদ্যালয় গড়ে উঠতো। এসব বিদ্যালয়ে অক্ষরজ্ঞান সংখ্যাজ্ঞান ও ধর্মীয় শিক্ষা দেয়া হতো।

খ) সাধারণত জমিদার বা অবস্থাসম্পন্ন ব্যক্তিদের বৈঠকখানায়, আটচালার নিচে, গাছতলায় বা শিক্ষকের নিজস্ব গৃহে এসব বিদ্যালয় বসতো। বিদ্যালয়ের সাজ-সরঞ্জাম খুবই সাধারণ ছিল।

গ) শিক্ষাদানের মান কুব উন্নত ছিল না। সাধারণ জ্ঞান সম্পন্ন অল্প বা অর্ধ শিক্ষিত শিক্ষক দ্বারাই বিদ্যালয় পরিচালিত হতো। শিক্ষকের নির্ধারিত তেমন কোন বেতন ছিল না। ছাত্র বেতনের প্রচলন ছিল না। ছাত্র-অভিভাবকদের দক্ষিণা, অবস্থাসম্পন্ন ব্যক্তিদের অর্থানুকূল্যে শিক্ষক জীবিকা নির্বাহ করতেন। অনেক সময় জীবিকার জন্য শিক্ষক অন্য পেশাও গ্রহণ করতেন।

ঘ) এসব বিদ্যালয়ে নির্ধারিত কোন পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক ছিল না। ছাপানো বই এর প্রচলন ছিল না বললেই চলে। শিক্ষার্থীরা শ্লেট, পেন্সিল, তালপাতা দিয়েই লেখাপড়ার কাজ চালাতো। সাধারণ অংক, শ্রুতলিপি, চিঠিপত্র লেখা ইত্যাদি শেখানো হতো। ফরাসী বিদ্যালয় বা মক্তবগুলো সাধারণত মসজিদে বসতো। এখানে ইসলাম ধর্মীয় পাঠ্যবস্তু শিক্ষা দেয়া হতো। এজন্য শিক্ষার্থীদের উচ্চারণ ও প্রকাশভঙ্গীর প্রতি বেশি লক্ষ্য রাখা হতো।

ঙ) স্থানীয় পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুযায়ী শিক্ষাদানের সময় ও নির্দিষ্ট দিন নির্ধারিত হতো। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তির নির্দিষ্ট কোন সময় ছিল না। বছরের যে কোন সময় শিক্ষার্থীরা ভর্তি হতে পারতো এবং শিক্ষা সমাপ্তিতে যে কোনো সময় বিদ্যালয় ত্যাগ করতে পারতো।

চ) বিদ্যালয়গুলো খুব বড় ছিল না। কোন বিদ্যালয় ১০/১৫ জনের বেশি শিক্ষার্থী ও ২/৩ টির বেশি শ্রেণি ছিল না। একজন শিক্ষকই বিদ্যালয় পরিচালনা করতেন। অধিকতর বড় বিদ্যালয়ে উচ্চ শ্রেণির অধিক অগ্রসর ও শাসন ক্ষমতায় দক্ষ শিক্ষার্থীদের (Senior student/Monitor) দ্বারা

পাঠদান কার্য সম্পন্ন করা হতো। শিক্ষকদের অনুপস্থিতিতে এ পড়ো সর্দারই শিক্ষকদের অনুকূলে শিক্ষাদান ও বিদ্যালয় পরিচালনা সম্পন্ন করতো। মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সী চ্যাপলিন (Presidency Chaplain) ডঃ এন্ড্রু বেল দেশীয় বিদ্যালয়ে পড়ো সর্দার ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বল্প ব্যয়ে অধিক শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ইংল্যান্ডের গরীব শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষা বিস্তাররের জন্য এ প্রথা সফলতার সাথে চালু করেন। ইংল্যান্ডে এ প্রথা ডঃ বেল এর নামানুসারে "বেল পদ্ধতি" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো স্বল্প ব্যয়ে স্থানীয় চাহিদা মাফিক বাস্তব শিক্ষাদান করতো বলে খুব জনপ্রিয় ছিল। এর প্রধান ত্রুটিগুলো হলো শিক্ষকের নিম্নমানের শিক্ষাগত যোগ্যতা, নিম্নমানের পাঠ্যদান পদ্ধতি, শিক্ষার্থীদের কঠোর শাস্তি প্রদানের প্রথা ইত্যাদি।

৪। উচ্চশিক্ষা

উচ্চ শিক্ষার জন্য মুসলমানদের মাদ্রাসা ও হিন্দুদের টোল নামে দু'ধরনের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। টোলের কাজ মন্দিরে এবং মাদ্রাসার কাজ মসজিদে অনুষ্ঠিত হতো। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষকের নিজ গৃহে অথাব কোন বিত্তশালী ব্যক্তির বৈঠকখানায় বিদ্যালয়ের কাজ চলতো। উভয় ধরনের বিদ্যালয়েই জমিদার, ধনী ব্যক্তি ও শাসক শ্রেণির নিকট থেকে অর্থ সাহায্য পেতো।

উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ উচ্চ শিক্ষিত ও শিক্ষাদান কার্যে অভিজ্ঞ ছিলেন। শিক্ষকগণ অর্থ গ্রহণ অপেক্ষা ধর্মীয় প্রেরণাতেই শিক্ষকতা করতেন। অনেক শিক্ষক ছাত্রদের অর্থ প্রদান করতেন। শিক্ষকদের নির্ধারিত বেতন ছিল না। শিক্ষাদানের বিনিময় স্বরূপ তাঁরা পৃষ্ঠাপোষকদের নিকট থেকে শস্যভূমি পেতেন। তা'ছাড়া বিত্তশালী ব্যক্তিদের নিকট থেকে নিয়মিত সাহায্য ও সাধারণ গৃহস্থে নিকট থেকে অর্থকরী চাঁদারও ব্যবস্থা ছিল।

মাদ্রাসায় আরবী বা ফারসী এবং টোলে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার মাধ্যম ছিল। টোলে ব্রাহ্মণ শিক্ষকগণই অধ্যানা করতেন। ব্রাহ্মণ ছাত্ররাই সেখানে অধ্যয়ন করত। নারী ও অব্রাহ্মণ ছাত্ররাচোলে পড়ার সুযোহ পেত না। টোল ও মাদ্রাসায় সাহিত্য, ছন্দ, দর্শন, জোর্তিবিদ্যা, তর্কশাস্ত্র, ব্যাকরণ ও ধর্মীয় মাস্ত উচ্চতর পর্যায়ের শিক্ষাদান করা হত। শিক্ষার মানের দিক থেকে উচ্চ শিক্ষার বিদ্যালয়গুলো আধুনিক কলেজ শিক্ষার সমপর্যায়ে ছিল। সংগঠন ও পরিচালন ব্যবস্থায় টোল অপেক্ষা মাদ্রাসা ছিল নিম্মানের নবাব বা বাদশাহী দরবারের উচ্চপদ লাভের জন্য ফারসী ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনের সে যুগে হিন্দু ছাত্ররাও এতে লেখাপড়া করত। মাদ্রাসায় ছাত্রদের ধর্মীয় ও নৈতিক মান অক্ষুন্ন রাখার দিকে গুরুত্ব আরোপ করা হত।

উচ্চ বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট সময়কাল ছিল না। সাধারণত শিক্ষার্থীদের ১০/১২ বছর উচ্চ শিক্ষার জন্য অধ্যয়ন করতে হত।

বাংলাদেশের নদীয়ায় অবস্থিত উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলো খুব জনপ্রিয় ছিল। নবদ্বীপ, মিথিলা, বিক্রমপুর, ফরিদপুরের কোটালীপাড়া সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে এবং মুর্শিদাবাদে, দিল্লী, আগ্রা প্রভৃতি স্থানগুলো আরবী ও ফারসী ভাষার মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষা প্রসিদ্ধ কেন্দ্র হয়ে উঠে।

৫। জাতীয় শিক্ষার বুনিয়াদ রচনায় দেশীয় শিক্ষার ভূমিকা

প্রশ্ন উঠে দেশীয় শিক্ষার মাধ্যমে জাতীয় শিক্ষার বুনিয়াদ রচনা সম্ভব ছিল কী?

একটি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা যতই ত্রুটিপূর্ণ হোক না কেন তাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন করা যায় না। প্রয়োজনীয় ও পরিকল্পিত সংস্কার ও বিস্তারের মাধ্যমেই শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন করতে হয়। ইংল্যান্ডের ত্রুটিপূর্ণ ভলান্টারী স্কুলগুলোকে একেবারে বাতিল বা ধ্বংস করে পরিকল্পিত সংস্কার ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে তাদের উন্নয়ন করা হয়েছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকেই দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থার অবক্ষয় শুরু হলেও এ্যাডাম ও অন্যান্য উর্ধ্বতন বৃটিশ কর্মকর্তা মনে করতেন দেশীয় শিক্ষার উপর ভিত্তি করে ভারতের একটি জাতীয় শিক্ষা

ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব এবং ভারতের সমগ্র শিক্ষা কাঠামোর একমাত্র নিশ্চিত ভিত্তি হওয়া উচিত দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা। এডাম আরও মনে করতেন "উচ্চতর হতে নিম্নতর সব রকমের দেশীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই ভারতীয় জনগণের বৈশিষ্ট্য ও চরিত্র উন্নয়নের সবচেয়ে উপযুক্ত বাহন। জনমনে সে চেতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে দেশীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে কাজে লাগানোই হবে সবচেয়ে সহজ, নিরাপদ, জনপ্রিয় ও সবচেয়ে ফলপ্রসু প্রকল্প।"

পড়ো সর্দার প্রথাকে ইংলান্ডের সফলতার সাথে কাজে লাগিয়ে ডাঃ বেল প্রসিদ্ধি লাভ করনে। অথচ ভারতে সে প্রথার কোন মূল্য দেয়া হয়নি। এভাবে বৃটিশ সরকারের বিমাতাসুলভ আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে এদেশীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে শূণ্যতা ও ব্যবধান সৃষ্টি হয় সে মূণ্যতা পূরণ ও ব্যবধান দূর করা সম্ভব হয়নি। এ্যাডাম প্রমুখ মনীষীর সুপারিশ মাফিক যদি দেশীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে সুবিন্যস্ত উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে ইংল্যান্ডের ভলান্টারী স্কুলগুলোর মত সুপরিকল্পিত ভাবে সংস্কার ও সম্প্রসারণ করা হতো তাহলে ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার রূপ নিঃসন্দেহে ভিন্ন হতে পারতো এবং ভারতীয় শিক্ষার বুনিয়াদ সম্ভব হতো।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জীবিকার প্রধান উপায় কী ছিল?
- (ক) ভূমির আয়
- (খ) ছাত্র-বেতন
- (গ) ব্যক্তিগত দান
- (ঘ) ছাত্র-অভিভাবক ও বিত্তশালীদের দান

২। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের সময় ও দিন ধার্য করা হতো–
- (ক) শিক্ষার্থীর প্রয়োজন অনুযায়ী
- (খ) শিক্ষকের প্রয়োজন অনুযায়ী
- (গ) শিক্ষক শিক্ষার্থীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী
- (ঘ) স্থায়ী পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুযায়ী

৩। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাধারণত শিক্ষার্থী সংখ্যা ছিল–
- (ক) ১০/১৫ জনের বেশি নয়
- (খ) ১৫/২০ জনের বেশি নয়
- (গ) ২০/২৫ জনের বেশি নয়
- (ঘ) ২৫/৩০ জনের বেশি নয়

৪। সংগঠন ও পরিচালন ব্যবস্থার মান বিচারে টোল অপেক্ষা মাদ্রাসা কেমন ছিল?
- (ক) উচ্চমানের
- (খ) নিম্নমানের
- (গ) সমমানের
- (ঘ) মান বিচার করা হতো না

৫। উচ্চ শিক্ষার বিদ্যালয়ে যে বিষয়টি পাঠদান করা হতো না, তাহলো–
- (ক) সাহিত্য
- (খ) ব্যাকরণ
- (গ) তর্ক শাস্ত্র
- (ঘ) বিজ্ঞান

৬। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে যে শিক্ষা দেয়া হতো, তাহলো–
- (ক) অক্ষর জ্ঞান
- (খ) সংখ্যা জ্ঞান
- (গ) ধর্মীয় জ্ঞান
- (ঘ) উপরের সব কয়টিই সঠিক

৭। বাদশাহী দরবারের উচ্চ পদ লাভের জন্য যে ভাষার প্রয়োজন ছিল তা'হলো–
- (ক) সংস্কৃত
- (খ) আরবী
- (গ) ফারসী
- (ঘ) পালি

৮। ‘পড়ো-সর্দার’ পদ্ধতি অনুসরণ করে ইংল্যান্ডে যিনি নতুন পদ্ধতির প্রবর্তন করে প্রসিদ্ধি লাভ করেন তার নাম হলো–

(ক) ডঃ এন্ড্রু বেল
(খ) ডঃ স্যাডলার
(গ) ডঃ গ্রাহাম
(ঘ) ডঃ বার্ক

পাঠ ১.২ এ্যাডামের রিপোর্ট ঃ বিভিন্ন দিক

এ পাঠ শেষে আপনি –

- উইলিয়াম এ্যাডাম প্রণীত রিপোর্ট সমূহের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বাংলা ও বিহার অঞ্চলের পাঁচটি জেলার দেশীয় শিল্প সম্পর্কিত তথ্য উপস্থাপন করতে পারবেন।
- দেশীয় শিক্ষার উন্নয়নে এ্যাডামের সুপারিশসমূহ উল্লেখ করতে পারবেন।
- গুপারিশসমূহ বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণ উল্লেখ করতে পারবেন।

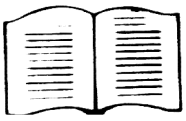

ঊনিশ শতকের প্রারম্ভে এ উপমহাদেশে সহজ ও অনাড়ম্বর শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের তদানীন্তন বড়লাট লর্ড বেন্টিংক জনশিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে দেশীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকারিতা নিরূপণের লক্ষ্যে মিশনারী ধর্ম প্রচারক উইলিয়াম এ্যাডমকে দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে বিশদ তথ্য সংগ্রহের জন্য নিযুক্ত করেন। শিক্ষাব্রতী মিশনারী বিবরণী প্রস্তুত করেছিলেন সেটি অনেক দিক দিয়ে ত্রুটিপূর্ণ হলেও নির্ভরযোগ্য এবং তাতে পূর্বের অন্যান্য বিবরনীয় সার সংক্ষেপও আছে। এ্যাডাম প্রণীত এ সমন্বিত বিবরণীতে দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থার চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে।

এ্যাডামের প্রথম রিপোর্ট

এ্যাডামের প্রথম রিপোর্ট খুব সংক্ষিপ্ত। এটি ছিল মূলত প র্ববর্তী সরকারী অনুসন্ধানের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। সরকারী নথিপত্র, জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইন্সট্রাকশন (GCPI) এর রিপোর্ট ও সমকালীন পত্র-পত্রিকা থেকে তৎকালীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে তিনি প্রথম রিপোর্ট প্রস্তুত করেন। ১৮৩৫ সালের ১ লা জুলাই এ রিপোর্ট পেশ করেন। তাঁর বিবরণীতে বলা হয় যে বাংলা ও বিহারের লোকসংখ্যা ছিল ৪ কোটি, বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ। এ হিসেবে প্রতি ৪০০ জনের একটি বিদ্যালয় ছিল। গ্রামের সংখ্যা ছিল ১৫০,৭৪৮টি। এ হিসেবে প্রতি ৩টি গ্রামে ২টি বিদ্যালয় ছিল।

রিপোর্টে উল্লেখিত বিদ্যালয়ের সংখ্যাকে অনেকে (যেমন স্যার ফিলিপ হার্টগ) নিছক অতিরঞ্জন ও কল্পনাপ্রসূত বলে উপহাস করেন। অনেকে (যেমন আর, ভি, পেরুলেকার) আবার এটাকে সঠিক বলে মনে করেন। অবশ্য বিদ্যালয় সম্পর্কে যে আধুনিক ধারনা অনুযায়ী এ সংখ্যা করেছেন। কোনো কোনো পরিবারের এক বা একাধিক ছেলে-মেয়ে সমস্ত পারিবারিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করত। এগুলোকে পারিবারিক বিদ্যালয় বলে গণ্য করা হতো। এ দিক থেকে ১ লক্ষ্য বিদ্যালয়ের হিসেব ছিল সঠিক। পরবর্তী সরকারী তথ্য সংগ্রহের ফলে দেখা গিয়েছে এ ধরনের পারিবারিক বিদ্যালয়সহ বাংলা ও বিহারের মোট বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ২৫ হাজার। ফলে এ্যাডামের উক্তির যথার্থতা প্রমানিত হয়েছে। ইতিপূর্বে ম্যাকস্মুলার, ওয়ার্ড, ম্যালিকম প্রভৃতি মনীষীর বিবরণীর ভিত্তিতে ভারতের অন্য অঞ্চলেও এই পরিমাণ বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা গেছে।

এ্যাডামের দ্বিতীয় রিপোর্ট

এ্যাডাম রাজশাহী জেলার নাটোর থানাকে কেন্দ্র করে তথ্যানুসন্ধানের বিবরণী প্রস্তুত করেন এবং ১৮৩৫ সালের ২৩শে ডিসেম্বর তাঁর রিপোর্ট পেশ করেন। নাটোরের লোকসংখ্যা ছিল ১৯৫,২৯৬। তন্মধ্যে ১২৯,৬৮০ জন মুসলমান ও ৬৫, ৬৫৬ জন হিন্দু। গ্রামের সংখ্যা ছিল ৪৮৫। এখানে ২৭টি বিদ্যালয়ে ২৬২ জন শিক্ষার্থী ছিল। তার বিবরণী অনুযায়ী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও শিক্ষার্থী সংখ্যার নিম্নরূপ হিসেবে পাওয়া যায়।

ক্রমিক নং	বিদ্যালয়ের নাম	বিদ্যালয়ের সংখ্যা	শিক্ষার্থীর সংখ্যা
১।	বাংলা স্কুল	১০	১৬৭
২।	ফারসী স্কুল	৪	২৩
৩।	আরবী স্কুল	১১	৪২
৪।	বাংলা ও ফারসী স্কুল	২	৩০
	সর্বমোট=	২৭	২৬২

তাছাড়া ২৩৮টি গ্রামের ১৫৮৮টি পরিবারে ২,৩৪২ জন ছাত্র গৃহে লেখাপড়া করতো। এ হিসেবে সাধারণ বিদ্যালয়ে পাঠরত শিক্ষার্থীর সংখ্যার চেয়ে গৃহে পাঠরত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৯ গুণ। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার গড় বয়স ছিল ৮ বছর ও বিদ্যালয় ত্যাগের গড় বয়স ছিল ১৪ বছর। গড়ে প্রতি শিক্ষক মাসে বেতন পেতেন ৫ টাকা ৮ আনা।

মুসলমানদের দ্বারা পরিচালিত উচ্চ শিক্ষার কোনো দেশীয় বিদ্যালয় ছিল না। নাটোরে ৩৮টি সংস্কৃত ভাষার উচ্চ বিদ্যালয় ছিল। এ সমস্ত বিদ্যালয়ে ৩৯৭ জন ছাত্র ছিল। তন্মধ্যে ১৩৬ জন শিক্ষার্থী ছিল ঐসব গ্রামের যেখানে উচ্চ বিদ্যালয়গুলো অবস্থিত ছিল এবং তারা অবৈতনিক শিক্ষালাভ করতো। বাকী ২৬১ জন অন্যান্য গ্রাম থেকে আসতো এবং তারা বিনা খরচে লেখাপড়া, আহার ও বাসস্থানের সুযোগ পেতো। নারী শিক্ষার তেমন কোনো প্রচলন ছিল না। এ্যাডাম নিম্নরূপভাবে ৬১২১ জন শিক্ষিত লোকের সংখ্যা নিম্নরূপ করেনঃ

১।	সংস্কৃত উচ্চ বিদ্যালয় (কলেজ) এর শিক্ষক	৩৯ জন
২।	উচ্চ শিক্ষিত কিন্তু শিক্ষক নন	৮৮ জন
৩।	উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী	১৯৭ জন
৪।	ভাল লিখতে ও পড়তে পারে এমন ব্যক্তি	৩,২০৫ জন
৫।	কোনো রকম পড়তে পারে ও নাম দস্তখত করতে পারে এমন ব্যক্তি	২৩৪২ জন
	মোট শিক্ষিত লোক =	৬১২১ জন

শুধু পুরুষ হিসাবে করলে শিক্ষিতের হার ছিল ৬.১% এবং নারীসহ সমগ্র জনসমষ্টি হিসাব করলে শিক্ষিতের হার ছিল ৩.১%।

এ্যাডামের তৃতীয় রিপোর্ট

১৮৩৮ সালের ২৮শে এপ্রিল এ্যাডাম তৃতীয় বিবরণী পেশ করেন। এ বিবরণী ২টি অংশে বিভক্ত ছিল। প্রথম অংশে মুর্শিদাবাদ বীরভূম, বর্ধমান, দক্ষিণ বিহার ও ত্রিহুত। বাংলা ও বিহারের এ পাঁচটি জেলার দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থার একটি পরিসংখ্যান প্রস্তুত করেন। দ্বিতীয় অংশে তিনি দেশীয় বিদ্যালয়গুলো সংস্কার সাধনের প্রস্তাব করেন।

এ্যাডাম উক্ত পাঁচটি জেলার ৮ রকমে মোট ২৫৬৭টি বিদ্যালয় খুঁজে পান। তন্মধ্যে বাংলা বিদ্যালয়–১০৯৯, হিন্দী বিদ্যালয়– ৩৭৬, সংস্কৃত বিদ্যালয়–৩, ফারসী বিদ্যালয়– ৬৯৪, আনুষ্ঠানিক আরবী বিদ্যালয়, আরবী বিদ্যালয়–৩৮, ইংরেজি বিদ্যালয়– ৪ ও বালিকা বিদ্যালয়–৬টি।

নিম্নোক্ত পাঁচটি জেলার বিদ্যালয় ও ছাত্রের একটি সাধারণ পরিসংখ্যান দেয়া হলো উল্লেখ্য যে, এ পরিসংখ্যানে পারিবারিক বিদ্যালয় ও তার শিক্ষার্থী সংখ্যা ধরা হয়নি।

জেলা	মোট লোকসংখ্যা	বিভিন্ন রকমের বিদ্যালয় সংখ্যা	মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা	শুধু ছাত্রীর সংখ্যা
মুর্শিদাবাবাদ	১,৮৬,৮৪১	১১৩	১৩৯৬	২৮
বীরভূম	১,২৬৭,০৬৭	৫৪৪	৭৩৫০	১১
বর্ধমান	১,১৮৭৫৮০	৯৩১	১৫,৮১৪	১৭৫
দক্ষিণ বিহার	১,৩৪০,৫১০	৬০৫	৫,৩০৬	-
ত্রিহুত	১৬৯৭,৭০০	৩৭৪	১৩১৯	-
সর্বমোট=	৫৬,৭৯,৭৯৮	২৫৬৭	৩০,৯১৪	২১৪

উক্ত পাঁচটি জেলার প্রত্যেকটিতে অন্ততঃ একটি থানার পরিসংখ্যান তিনি নিজে সংগ্রহ করেন। অন্যগুলোতে তাঁর সহকর্মীরা তথ্য সংগ্রহ করেন। থানাগুলো মুর্শিদাবাদ শহর, দৌলতবাজার, নাংগলিয়া, কুলনা, জেহানাবাদ ও ভাওয়ারা। উক্ত ছয়টি থানায় ৩৭৩টি সাধারণ বিদ্যালয় ও ১৭৪৭ টি পারিবারিক বিদ্যালয় ছিল। মোট ৬৭৮৬ জন শিক্ষার্থী ছিল। তন্মধ্যে ৪৩৭২ জন সাধারণ বিদ্যালয়ে ও ২৪০৪ জন ছিল পারিবারিক বিদ্যালয়ে। জনসংখ্যার অনুপাতে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সংখ্যা ছিল ৭৩ জনে ১ জন।

মুর্শিদাবাদ শহর ও উক্ত পাঁচটি থানায় মোট ৩৫৪,০৯৯ জন (বয়স ১৪ বছরের উর্ধ্বে মোট ২১,৯১১ জন স্বাক্ষর বা শিক্ষিত লোক ছিল। শিক্ষিতের হার ৬.১%।

দেশীয় শিক্ষা উন্নয়নে এ্যাডামের সুপারিশ

উইলিয়াম এ্যাডাম মনে করেন যে, দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা ত্র€টিপ র্ণ হলেও জাতীয় শিক্ষা কাঠামো গঠনে তা ছিল একমাত্র নিশ্চিত ভিত্তি। ছোট বড় সব রকমের দেশীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো জনগণের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য উন্নয়নের সবচেয়ে উপযুক্ত বাহন এবং এ উদ্দেশ্যে দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে কাজে লাগানো সবচেয়ে সহজ, নিরাপদ, জনপ্রিয় ও সবচেয়ে ফলপ্রস প্রকল্প। এজন্য এ্যাডাম তাঁর তৃতীয় বিবরণীতে দেশীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সংস্কার ও উন্নয়নের জন্য নিম্নোক্ত কতকগুলো সুচিন্তিত ও সুনির্দিষ্ট সুপারিশ পেশ করেন।

১। প্রথমতঃ এক বা একাধিক জেলাকে নির্বাচিত করে পরীক্ষাম লকভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

২। কম বেশি তাঁর অনুসৃত পন্থায় নির্বাচিত জেলা বা জেলাগুলোর শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপক তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

৩। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর ব্যবহারে জন্য আধুনিক ভারতীয় পাঠ্য পুস্তক রচনা করতে হবে।

৪। প্রতি জেলায় পরিকল্পনার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে একজন পরীক্ষক নিয়োগ করতে হবে। তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য হবে তাঁর এলাকার তথ্য সংগ্রহ করা, শিক্ষকদের সাথে মিলিত ও পরিচিত হওয়া, পাঠ্যপুস্তকের ব্যবহার ব্যাখ্যা করা, পরীক্ষা পরিচালনা করা, পারিতোষিক ও পুরস্কার বিতরণ করা এবং সফলতার সাথে উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিচালনা করা।

৫। শিক্ষকদের মধ্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করে অধ্যয়নের জন্য উৎসাহিত করতে হবে। পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে কৃতকার্য শিক্ষকদের পুরস্কার দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এ্যাডাম শিক্ষণ বিদ্যালয় (Normal School) প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেন। এখানে শিক্ষকগণ ৪ বছর ধরে প্রতি বছর ১ মাস হতে ৩ মাস অধ্যয়ন করবেন যাতে ছাত্রদের অসুবিধা না করে তাঁরা তাঁদের যোগ্যতার উন্নয়ন করতে পারবেন।

৬। শিক্ষক যাতে নবলব্ধ জ্ঞান ছাত্রদের প্রদান করেন এ জন্য তাদের উৎসাহ দিতে হবে। শিক্ষকগণ ছাত্রদের পরীক্ষা গ্রহণ করে পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৭। গ্রামাঞ্চলের বিদ্যালয়গুলোকে প্রয়োজনীয় জমি প্রদান করতে হবে যাতে শিক্ষকগণ গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস করে শিক্ষাদন কার্যে আত্মনিয়োগ করতে পারে। কোথা থেকে এসব জমির দান আসতে পারে এ্যাডাম তাঁর রিপোর্টে কয়েকটি উৎসেরও উল্লেখ করেন।

উইলিয়াম এ্যাডামের সুপারিশগুলো নিঃসন্দেহে সুচিন্তিত ও মূল্যবান ছিল। এগুলো যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পুনরুজ্জীবন করতে পারলে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সত্যিকার উন্নতি হতো। কিন্তু বড়লাটের নির্বাহী পরিষদের আইন সদস্য ও GCPI এর সভাপতি লর্ড মেকলে দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা পুনরুজ্জীবনের পরিবর্তে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রর্বতনের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। বড়লাট লর্ড বেন্টিংক এ্যাডামের পরিকল্পনার গুরুত্ব অনুধাবন না করে দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে একেবারে বাতিল করে দেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.২

সঠিক উত্তরে পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১। উইলিয়াম এ্যাডাম তাঁর জরীপ কাজ শেষে কয়টি রিপোর্ট পেশ করেন?
- (ক) ৩টি
- (খ) ৪টি
- (গ) ৫টি
- (ঘ) ৬টি

২। কোন অঞ্চলকে কেন্দ্র করে এ্যাডাম তথ্যনুসন্ধান করে তাঁর প্রথম রিপোর্ট পেশ করেন?
- (ক) মুর্শিদাবাদ
- (খ) দক্ষিণ বিহার
- (গ) বাংলা ও বিহার
- (ঘ) বীরভূমি

৩। নাটোর থানায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা কত ছিল?
- (ক) ২৭টি
- (খ) ৩০টি
- (গ) ৩৫টি
- (ঘ) ৪০টি

৪। পারিবারিক বিদ্যালয়সহ বাংলা ও বিহারে বিদ্যালয়ের সংখ্যা কত ছিল?
- (ক) পঞ্চাশ হাজার
- (খ) আশি হাজার
- (গ) ১ লক্ষ ২৫ হাজার
- (ঘ) দেড় লক্ষ

৫। প্রতি জেলায় পরিকল্পনার নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে কী নিয়োগ করার প্রস্তাব গৃহীত হয়?
- (ক) একজন পরিদর্শক
- (খ) একজন সচিব
- (গ) একজন পরীক্ষক
- (ঘ) একজন পরিচালক

৬। কাদের ব্যবহারের জন্য এ্যাডাম আধুনিক ভারতীয় ভাষায় পাঠ্য পুস্তক রচনা করার সুপারিশ করেন?
- (ক) শিক্ষকের জন্য
- (খ) শিক্ষার্থীদের জন্য
- (গ) শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের জন্য
- (ঘ) অভিভাবকদের জন্য

৭। গ্রামের স্কুলের শিক্ষকগণ যাতে স্থানীয়ভাবে বসবাস করে শিশু-শিক্ষায় মনোনিবেশ করতে পারে সে জন্য এ্যাডাম স্কুলকে কি প্রদান করার সুপারিশ করেন?
- (ক) চাঁদা
- (খ) জমিজমা
- (গ) খাদ্যশস্য
- (ঘ) অনুদান

৮। এ্যাডাম কোন ধরনের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেন?

(ক) প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়
(খ) সাধারণ বিদ্যালয়
(গ) কারিগরী বিদ্যালয়
(ঘ) নর্মাল বিদ্যালয়

৯। কার অনুসৃত পন্থায় এ্যাডাম তথ্য সংগ্রহের প্রস্তাব দেন?
(ক) নিজ অনুসৃত পন্থায়
(খ) মুনরো অনুসৃত পন্থায়
(গ) মেকলে অনুসৃত পন্থায়
(ঘ) ম্যালকম অনুসৃত পন্থায়

১০। এ্যাডামের দেশী উন্নয়নের পরিকল্পনা কে বাতিল করেন?
(ক) লর্ড মেকলে
(খ) টমাস মুনরো
(গ) লর্ড বেন্টিংক
(ঘ) লর্ড ডালহৌসি

পাঠ ১.৩ শিক্ষার ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তা

এ পাঠ শেষে আপনি –

- শিক্ষার ইতিহাসের সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- শিক্ষার ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবেন।

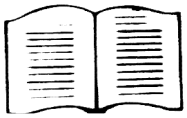

অতীত আমাদের কাছে অজ্ঞাত। আমরা বর্তমানকালে বাস করি এবং বর্তমানকেই জানি। তবে বর্তমানকে বুঝতে হলে অতীতকে জানা দরকার। বস্তুত ইতিহাসই অতীতের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয়। তাই ইতিহাসকে অতীত ঘটনার ইতিবৃত্ত বলা হয়ে থাকে। ব্যাপক অর্থে অতীতে যা ঘটেছে তাই ইতিহাস। বৈজ্ঞানিক প্রথায় সংগৃহীত তথ্যের বিচার-বিশ্লেষণ, সংগঠন ও সমন্বয় দ্বারা মানব জাতির অতীত বিবর্তনের যে ধারাবাহিক অবিচ্ছেদ্য চলমান প্রগতির বিবরণ সংগ্রহ করা যায় তাই ইতিহাস নামে পরিচিত। অতীতের যা কিছু সংরক্ষণ করা হয়েছে কেবল তাই বর্তমানকালের মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব। অতীত ঘটনার কোনো রক্ষিত নির্দশনকেই ইতিহাসের বিষয়বস্তু বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

কোনো দেশের ইতিহাস বলতে সেই দেশের অতীত যুগের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার তথ্যপূর্ণ ধারাবাহিক বিবরণই বোঝায়। এই ইতিহাসে শুধু রাজা, সম্রাট ও মন্ত্রীদের কাহিনী লিপিবদ্ধ হয় না– রাজনৈতিক গতিধারাকে কেন্দ্র করে মানুষের সমাজ, অর্থনীতি, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, শিক্ষা ও সংস্কৃতির পরিপূর্ণ বিবরণ সন্নিবেশিত হয়। অর্থাৎ ইতিহাসের প্রধান উপাদান হলো দেশ, মানুষ, স্থান কাল, দেশ এবং সমাজ ভেদে মানব জাতির ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস। ইতিহাস শুধুমাত্র ঘটনা নয়, ঘটনার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাই হল ইতিহাস।

শিক্ষার ইতিহাস ইতিহাসের একটি প্রধান অংশ। মানব সমাজের শিক্ষার তথ্য ও তত্ত্ব সম্বলিত বিবরণকে সাধারণ অর্থে শিক্ষার ইতিহাস বলা হয়। ব্যাপক অর্থে শিক্ষার ইতিহাস বলতে সভ্যতার উষালগ্ন থেকে আরম্ভ করে বর্তমানকাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দেশে ও সমাজে শিক্ষার যে বিকাশ ও উন্নতি সাধিত হয়ে এসেছে তার আলোচনাকেই বুঝায়। অর্থাৎ মানব জাতির বিকাশের প্রামাণ্য বিবরণই হলো শিক্ষার ইতিহাস।

মানব জীবনের সামগ্রিক কার্যাবলী ইতিহাসের অন্তর্ভূক্ত। এসব কার্যাবলী রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মতাত্ত্বিক হতে পারে। তবে এসব মানদন্ডের মূল কথা হল শিক্ষা। একটি জাতির সভ্যতার মান, তার সংস্কৃতি, দর্শন ভাবধারা ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা সবকিছুর আদি কথা হল শিক্ষা। শিক্ষা দ্বারাই একটি জাতি বা সমাজ উন্নত হয় আবার শিক্ষাহীনতার দরুণ তার অধঃপতন হয় অর্থাৎ শিক্ষার অভাবে যে কোন জাতি বা সমাজ জ্ঞানান্ধকারে নিমজ্জিত থাকে এবং ইহার ইতিহাস বলতেও তেমন কিছু থাকে না। সুতরাং শিক্ষা ও ইতিহাসরে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। একটি অপরটির সহায়ক ও সম্পুরক।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের পাঠ্য তালিকায় শিক্ষার ইতিহাসকে একটি আবশ্যিক পাঠ্য বিষয় হিসাবে প্রবর্তন করা হয়েছে। এর পিছনে অনেক যুক্তি রয়েছে। বর্তমান হলো অতীতের সন্তান। আধুনিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির উপর অতীতের প্রভাব অনস্বীকার্য। রাজনৈতিক ইতিহাস অপেক্ষা সংস্কৃতিগত ইতিহাসের গতিধারা অনেক বেশি সুদৃঢ়। এই গতিধারাকে মুছে ফেলা বা এর উপর বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে আসা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। তবুও শিক্ষার অগ্রগতি ও যুগের প্রয়োজন অনুসারে মানুষ প্রয়োজনভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলে। বর্তমানে আমরা এমন একটা যুগের সন্ধিক্ষণে পৌঁছে গেছি যখন আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে আসা একান্ত প্রয়োজন। আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা আজ চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন। একে উন্নয়নের পথে পরিচালিত করতে হলে প্রথম প্রয়োজন হবে শিক্ষা ধারার পরিবর্তন।

এ সম্পর্কে আমাদের যথাযথভাবে দিক নির্দেশনা দিতে পারে অতীতের ইতিহাস। অতীতে একটা নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে গড়ে উঠেছিল বৈদিক ও ব্রাহ্মান্য শিক্ষা ব্যবস্থা। তার অবক্ষয়ের পথে এসেছিল বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থা। খৃষ্ট্রীয় সপ্তম শতকে আরবের বুকে ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের পর মুসলিম জাতি জ্ঞানের আলোক বর্তিকা বহন করে দিকদিগন্তে নব নব আলোক রশ্মি বিচ্ছুরিত করতে থাকে। ভারতীয় উপমহাদেশও মুসলিম জাতির আপন বৈশিষ্ট্যমন্ডিত শিক্ষা ব্যবস্থার মহান ঐতিহ্যের সংস্পর্শে আসে। ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসন আমলে নতুন নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা এ দেশে প্রবর্তিত হয়েছিল। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে নতুন করে গড়ে তুলতে গেলে অতীতের সেই বিশেষ বিশেষ অবস্থাগুলিকে যাচাই করতে হবে। অন্যথায় আমাদের মহান ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়।

অপরদিকে আধুনিক প্রেক্ষাপটে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে রূপ দিতে হলে শুধুমাত্র আমাদের দেশের শিক্ষার ইতিহাস জানলেই চলবে না। বর্তমানে যুগ শিল্প, প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের যুগ যা সভ্যতাকে এক নতুন পথে প্রবাহিত করেছে। এ সভ্যতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখার জন্যই পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোর শিক্ষাধারাও আমাদের জানতে হবে।

আবার প্রাচীনকাল হতে চিন্তাবিদগণ শিক্ষা সম্বন্ধে যুগপযোগী নানা মতবাদ ব্যক্ত করে গিয়েছেন। একটা নির্দিষ্ট যুগের পরিস্থিতিতে তাঁদের চিন্তা ও চেষ্টা কেমন ছিল এবং সে অনুসারে আজকের পরিস্থিতিতে সে চিন্তাধারাকে কতটুকু কাজে লাগানো যায় তাও বিচার করতে হবে।

ফলে, শিক্ষার ইতিহাসে বিদেশী শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষাবিদদের চিন্তা ও প্রচেষ্টা স্থান লাভ করেছে এবং এসব শিক্ষা পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত মূল্যবান। শিক্ষার ইতিহাস থেকে আমরা এসব জানতে পারি এবং দেশের কাজে সুবিধামত লাগাতে পারি।

আমাদের সরকার জাতীয় শিক্ষানীতি প্রবর্তনে আগ্রহী। জাতীয় শিক্ষানীতিকে সুষম ভিত্তিক করে গড়ে তুলতে হলে শিক্ষার ইতিহাসের জ্ঞান অপরিহার্য। শিক্ষার অতীত ঐতিহ্যময় ইতিহাসই আমাদের বর্তমান রুচি, অভিজ্ঞতা ও চিন্তাধারাকে পরিশুদ্ধ ও বর্তমান পরিমার্জিত করে জাতীয় কাঠামোতে নতুন ও আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা রূপায়ণে যথাযথ অবদান রাখতে পারে।

আধুনিককালে শিক্ষকতা একটি মর্যাদাপূর্ণ পেশা হিসেবে বিবেচিত। এই পেশাগত অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধিশালী করার জন্য অতীতের বিভিন্ন সমাজের শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষাবিদদের চিন্তাভাবনা প্রশিক্ষণরত শিক্ষকদের জানা একান্ত আবশ্যক। শিক্ষার ইতিহাস পাঠ করে তাদের পক্ষে অতীত কালের বিভিন্ন সমাজ ব্যবস্থার শিক্ষা পদ্ধতি, শিক্ষাবিদ, খ্যাতনামা দার্শনিকদের মতবাদ ও বিভিন্ন বাস্তবধর্মী শিক্ষার নীতি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয়।

স্বাধীন বাংলাদেশের শিক্ষা নতুনভাবে বিন্যাস করা হয়েছে। জাতির আশা আকাংখার লক্ষ্যে যে শিক্ষার রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়েছে তা বাস্তবায়নের দায়িত্ব শিক্ষকদেরই। তাদের পেশাগত প্রস্তুতি, অভিজ্ঞতা এবং মান উন্নয়নের জন্য শিক্ষার ইতিহাস জানা দরকার। ট্রেনিং কলেজ ও দূর শিক্ষণের মাধ্যমে বি.এড প্রশিক্ষণার্থীদের পেশাগত চাহিদা বিবেচনা করে এবং ভবিষ্যতে তাদের অভিজ্ঞ শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে শিক্ষার ইতিহাসকে একটি আবশ্যিক বিষয়রূপে পাঠ্যক্রমে স্থান দেওয়া হয়েছে। সুতরাং বি.এড প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য শিক্ষার ইতিহাস অধ্যয়ন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৩

সঠিক উত্তরে পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১। ইতিহাসের প্রধান উপাদান কি?
- (ক) দেশ
- (খ) কাল
- (গ) মানুষ
- (ঘ) সবগুলোই

২। শিক্ষার ইতিহাসে কী কী সন্নেবেশিত হয়?
- (ক) মানুষের সমাজ
- (খ) অর্থনীতি
- (গ) ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান
- (ঘ) উপরের সবগুলোই

৩। শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের পাঠ্য তালিকায় শিক্ষার ইতিহাস কী ধরনের পাঠ্য বিষয়?
- (ক) আবশ্যিক
- (খ) অনাবিশ্যিক
- (গ) ঐচ্ছিক
- (ঘ) কোনটিই নয়

৪। আরবের বুকে ইসলাম ধর্মের আর্বিভাব হয় কত শতকে?
- (ক) সপ্তম শতকে
- (খ) পঞ্চম শতকে
- (গ) চতুর্থ শতকে
- (ঘ) তৃতীয় শতকে

৫। শিক্ষকতা কোন ধরনের পেশা?
- (ক) অমযার্দাপূর্ণ পেশা
- (খ) মর্যাদাপূর্ণ পেশা
- (গ) গুরুত্বহীন পেশা
- (ঘ) কোনোটিই নয়

পাঠ ১.৪ শিক্ষার ইতিহাসের উপাদান

এ পাঠ শেষে আপনি –

- শিক্ষার ইতিহাসের উপাদানগুলির নাম বলতে পারবেন।
- শিক্ষার ইতিহাসের উপাদনগুলি বর্ণনা দিতে পারবেন।

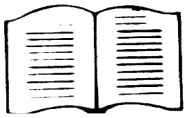

সামাজিক ও রাজনৈতিক তথ্যপূর্ণ বিশদ বিররণ নিয়ে কোনো দেশের পরিপূর্ণ ধারাবাহিক কালানুক্রমিক ইতিহাস রচিত। প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের লিখিত কোনো ইতিহাস নেই। তবে লিখিত ইতিহাসের অভাব থাকলেও ইতিহাসের উপাদানের কোনো অভাব এ দেশে নেই। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, শিলালিপি, তাম্রলিপি, মুদ্রা ও তৎকালীন লিখিত নানাবিধ গ্রন্থ থেকে ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করতে পারি। এছাড়াও স্থাপত্য শিল্প, ভাস্কর্য শিল্প, মসজিদ, মন্দির ইত্যাদি নিদর্শন থেকেও আমরা ইতিহাসের উপাদান পেতে পারি।

শিক্ষার ইতিহাসের প্রথম ও প্রধান উৎস হিসেবে প্রাচীন আমলে লিখিত সাহিত্যাদির উলে-খযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথমতঃ তৎকালীন সময়ে লিখিত বেদ, বেদান্ত, পুরান, দর্শন শাস্ত্র, নাটক, কাব্যগ্রন্থাদী ইত্যাদিতে প্রাচীন ভারতের সমাজ, সভ্যতা ও শিক্ষা সম্পর্কে বহু মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। আবার খৃষ্ট্রীয় অষ্টম শতকে ভারতবর্ষে মুসলমানদের আগমন ঘটে। ধর্মীয় অনুপ্রেরণার ফলে মুসলমানগণ প্রথম থেকেই শিক্ষা বিস্তারে ব্রতী হয়। ইসলামে শিক্ষার দ্বার জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্য উন্মুক্ত। ইসলামে শিক্ষার মূল ভিত্তি হলো বিশ্বগ্রন্থ আল কোরান এবং মহানবী (দঃ) এর অমীয় বাণী হাদিস। অর্থাৎ কোরান ও হাদিস আমাদের শিক্ষার অন্যতম প্রধান উৎস।

দ্বিতীয়তঃ শিলালিপি, তাম্রলিপি ও নানাবিধ অনুশাসনকে শিক্ষার ইতিহাসের অন্যতম উপাদান বলা চলে। লিপির ব্যবহার এক সময় জনশিক্ষার পথকে সুগম করেছিল। তৃতীয়ত প্রাচীনকালের স্থাপত্য শিল্প, ভাস্কর্যশিল্প, কলা প্রভৃতি ব্যবহারিক শিক্ষার কথা প্রকাশ করে। মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পার নাগরিক সভ্যতা থেকে উপমহাদেশ ব্যবহারিক শিক্ষার বাস্তব আভাস পাওয়া যায়। এসব নিদর্শন নিঃসন্দেহে শিক্ষার ইতিহাসের অমূল্য উপাদান।

তৃতীয়তঃ প্রাচীন ভারতের শিক্ষা কেন্দ্রের বিবরণ ও অনেকগুলি ধ্বংসাবশেষ সংরক্ষণ করা হয়েছে। এগুলিও শিক্ষার ইতিহাসের অমূল্য উপাদান। তক্ষশীলা, নালন্দা, বিক্রমশীলা, ঋষি-আশ্রমের বিবরণ প্রভৃতি প্রাচীন ভারতের শিক্ষাকেন্দ্র ও শিক্ষাদর্শের কথা বিবৃত করে। অনুরূপভাবে, বায়তুল হিকমাহ, নিযামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, আল আজহার ও কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্রের মূল্যবান নিদর্শন বহন করছে।

চতুর্থতঃ লিখিত বিবরণী শিক্ষার ইতহাসের মূল্যবান উপাদান। এসব বিচিত্র উৎস থেকে আমাদের শিক্ষার সুদৃঢ় ভিত্তি, তার প্রচার ও প্রসারের ইতিকথা অবগত হওয়া যায়। পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যদেশগুলির মধ্যে ভারতীয় উপমহাদেশ অন্যতম। প্রাচীন যুগ থেকেই এদেশে এক ধরনের শিক্ষা কাঠামো গড়ে উঠেছিল। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের সংস্কৃতিগত বৈশিষ্ট্য আত্মপ্রকাশ করে। কোনো দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতি সমকালীন জনসমাজ, প্রকৃতি ও পরিবেশগত প্রভাব, ভৌগলিক প্রভাব, ধর্ম ও জীবন দর্শনের প্রভাব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গড়ে উঠতে পারে না। আমাদের দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রেও এরূপ বিচিত্র প্রভাব বিদ্যমান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৪

সঠিক উত্তরে পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১। শিক্ষার রূপরেখা বাস্তবায়নে কারা বেশি ভূমিকা রাখেন?
- (ক) শিক্ষকরা
- (খ) পরিকল্পনা প্রণয়নকারীরা
- (গ) শিক্ষাবিদরা
- (ঘ) প্রশাসকরা

২। শিক্ষার ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তা কী?
- (ক) রাজনৈতিক উন্নয়রে জন্য
- (খ) অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য
- (গ) সামাজিক উন্নয়নের জন্য
- (ঘ) শিক্ষাধারার উন্নয়ন ও পরিবর্তনের জন্য

৩। নিচের কোনটি শিক্ষার ইতিহাসের উপাদান নয়?
- (ক) রাজনৈতিক বিবরণ
- (খ) প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দশন
- (গ) লিখিত সাহিত্যাদির বিবরণ
- (ঘ) শিলালিপি

৪। প্রাচীনকালের ভাস্কর্যশিল্প, স্থাপত্য শিল্প কোন ধরনের শিক্ষার কথা প্রকাশ করে?
- (ক) সুন্দর মনের শিক্ষা
- (খ) ব্যবহারিক শিক্ষা
- (গ) দার্শনিক শিক্ষা
- (ঘ) জীবনব্যাপী শিক্ষা

৫। কোনো দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতি কোনটির নির্ভরশীল?
- (ক) ধর্মের উপর নির্ভরশীল
- (খ) জীবন দর্শনের উপর নির্ভরশীল
- (গ) ভৌগলিক অবস্থানের উপর নির্ভরশীল
- (ঘ) জনসমাজ, প্রকৃতি, পরিবেশ, ভৌগলিক অবস্থান ধর্ম ও জীবন দর্শনের উপর নির্ভরশীল।

পাঠ ১.৫ পবিত্র কোরানে শিক্ষার গুরুত্ব

এ পাঠ শেষে আপনি –

- এ পাঠ অধ্যয়ন করে পবিত্র কোরানে শিক্ষার প্রতি যে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তা বর্ণনা করতে পারবেন।

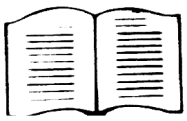

১। কোরানের সর্বপ্রথম অবতীর্ণ আয়াতের অর্থ

সমগ্র মানব জাতির প্রতি আল্লাহর প্রথম আদেশ অর্থাৎ পবিত্র কোরানের প্রথম অবতীর্ণ আয়াত হলো, "ইকরা বি ইসমি রাব্বিকাল্লাজী খালাক" পড়ো তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবীর অন্য কোনো ধর্মগ্রন্থে বিশ্ব মানুষের প্রতি জ্ঞানানুশীলনের জন্য এভাবে সরাসরি তাগিদ দেয়া হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। জ্ঞানের মাধ্যমেই এ বিধানকে কার্যকরী করা সম্ভব। তাই ইসলাম শিক্ষার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। পবিত্র কোরান শরীফে পড়ো এই নির্দেশ সর্বপ্রকার অজ্ঞতার অপসারণ করে সৃষ্ট জগতের সকল রহস্য উদঘাটন ও আল্লাহর সৃষ্টির মাহাত্ত সম্যকভাবে উপলব্ধিকরণ এবং বাস্তব জীবনে তা কাজে লাগিয়ে সার্থক জীবনযাপন করারই তাগিদ।

পড়ো অর্থাৎ জ্ঞানাহরণ করো। কেননা জ্ঞানই কল্যাণ। একমাত্র জ্ঞানই মানুষকে তার সত্ত্বা উপলব্ধি করতে সাহায্য করে; কর্তব্য নির্ধারণে সহায়ক হয়। জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা করাই তার পৃথিবীর সর্বশক্তির ওপর প্রাধান্য বিস্তার করা সম্ভব হয়। তাই জ্ঞানার্জনকে আল্লাহ আমাদের জন্য ফরয বা অবশ্যকরণীয় কাজের অন্তর্ভূক্ত করে দিয়েছেন।

২। শিক্ষা সর্কে অবতীর্ণ অন্যান্য কতিপয় আয়াত

জ্ঞান অর্জনের উপর কোরানের অসংখ্য বাণী রয়েছে। জ্ঞান ও শিক্ষার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে এই সকল বাণীতে আলোকপাত করা হয়েছে। যেমন হে প্রভু, আমার জ্ঞান বর্ধিত করে দাও। এখানে শিক্ষা দ্বারা সৃষ্টিতত্ত্ব উদঘাটনের কথা বলা হয়েছে। জ্ঞান মানুষের আত্তিক বিকাশের হাতিয়ার। এই হাতিয়ার দ্বারা মানুষ যে কোনো বিষয়ের ধারণা বা অর্ন্তদৃষ্টি লাভ করতে পারে। মানুষ এর দ্বারা বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করে এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বুঝতে সক্ষম হয়। জ্ঞানের শক্তিদ্বারা মানুষ তার সত্তা উপলব্ধি করতে পারে এবং জীবনের সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা অর্জন করে। জ্ঞান শুধুব্যক্তির আর্থিক উন্নতি বিধান করে না বরং জাগতিক প্রয়োজনেও আল্লাহ মানুষকে জ্ঞান অর্জনের ক্ষমতা দিয়েছেন। এই ক্ষমতা দ্বারা মানুষ আল্লাহর সৃষ্টির রহস্যের দ্বার উদঘাটন করতে পারে। তাই মানব জীবনকে সার্থক করে তোলবার জন্যই পড়ো এই শ্রেষ্ঠ বাণীর মাধ্যমে বিশ্ব মানবতার প্রতি আল্লাহ জ্ঞান অর্জনের আদেশ দিয়েছেন।

পবিত্র কোরানে আরও বলা হয়েছে, তোমার জ্ঞান না থাকলে জ্ঞানী ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করো। যারা জ্ঞানী আল্লাহ তাদের উচ্চাসনে সমাসীন করবেন। যারা জানে তারা কী যারা জানে না তাদের সমান? এখানে জ্ঞানের কথাই বলা হয়েছে।

কোরানের উদার দৃষ্টিভঙ্গি মানুষের জ্ঞান অর্জনের পথকে সুগম করেছে। কোরান সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছে আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এতে এবং আমাদের পূর্ববর্তীদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছিল তাতেও আমরা বিশ্বাস পোষণ করি। এভাবে কোরান সব সত্য, সব শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার নির্দেশ দিচ্ছে এবং যেখানে যা কিছু ভালো, যা কিছু মহৎ ও যা কিছু গ্রহণীয় ও শিক্ষণীয় তা গ্রহণের জন্য দিচ্ছে সুস্পষ্ট তাগিদ। এই তাগিদের ফলেই মুসলমান জাতি জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চায় আকৃষ্ট হয়ে পৃথিবীর জ্ঞান ভান্ডারে অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছিল।

জ্ঞানের জন্য মানুষ যে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী কোরানের একটি ঘটনা থেকে তা সহজেই প্রতীয়মান হয়। সৃষ্টির প্রথমেই আল্লাহ ফেরেশতাদের হুকুম দিয়েছিলেন মানব জাতির আদিম পিতা হযরত

আদমকে সম্মান পূর্বক সেজদা দিতে। তার একমাত্র কারণ ছিল জ্ঞান ও শিক্ষা। সুরা বাকারাতে এই ঘটনার বিবরণ রয়েছে এবং আল্লাহ মানব জাতিকে জ্ঞান ও শিক্ষা বিস্তারে ও জ্ঞানের আলো বিকীরণে উদ্বুদ্ধ করে বলেছেন, "এবং আল্লাহ পাক আদম (আঃ) কে সব বিষয়ের জ্ঞান দান করলেন, পরে ফেরেশতাদের সম্মুে উপস্থাপিত করলেন, তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে বল, যে সব জিনিস দেখেখে তন্মধ্যে কার কী নাম; কার কী গুণ? তখন ফেরেশতারা জবাব দিল, "হে মাবুদ তুমি দয়া করে যেটুকু আমাদের শিক্ষা দিয়েছো, তার বেশি আমরা জানি না।" তখন আল্লাহ আদমকে প্রতিটি বিষয়ের বর্ণনা দিতে বলেন। আদম সব প্রশ্নের জওয়াব দিতে সক্ষম হলেন, কেননা তিনি স্বয়ং আল্লাহর কাছ থেকে জ্ঞান লাভ করেছিলেন।

এলত এই কারণেই আল্লাহ আদমকে সম্মানসূচক সেজদা করতে ফেরেশতাদের হুকুম দিয়েছিলেন। এই দৃষ্টান্ত জ্ঞানের মাহাত্ত ও শিক্ষার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। আর এই অনুপ্রেরণা থেকে মানব জাতি জ্ঞান সাধনা ও শিক্ষা বিস্তারের ব্রত গ্রহণ করে।

আবার কোরানের সর্বপ্রথম অবতীর্ণ পাঁচটি আয়াতেও মানুষকে জ্ঞান চর্চার জন্য আহবান করা হয়েছে।

সুরায়ে আলোকে আল্লাহ বলেছেন,পাঠ করো তোমার প্রভুর নামে যিনি স্রষ্টা ও শাসনকর্তা, যিনি মানুষকে এক বিন্দু জমাট রক্ত হতে সৃস্টি করেছেন, পাঠ করো অর্থাৎ জ্ঞান অর্জন করো, তোমার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত যিনি মানুষকে কলমের দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানত না, তা তাকে শিখিয়েছেন। এই আয়াতে সর্ব প্রথম জ্ঞান অন্বেষণ ও বিদ্যা অর্জনের তাগিদ রয়েছে। যিনি সমগ্র সৃষ্টি জগতের স্রষ্টা তার পক্ষে মানুষের অজ্ঞানতা দূরীভূত করা এবং জ্ঞানের আলোকে অন্তরকে আলোকিত করা আদৌ কঠিন নয়। এতে বোঝা যায় মানুষ যা কিছু অজ্ঞাতকে জেনেছে আল্লাহ তালায়ার তরফ থেকে, আর সেই জ্ঞানের মাধ্যম হলো কলম বা জ্ঞান চর্চা। এসব উল্লিখিত আয়াতসসূহে মানব সৃষ্টির রহস্য, আল্লাহ পাকের পরিচিতি, সৃষ্ট জগত ও স্রষ্টার সাথে মানুষের সম্পর্ক, জ্ঞানের উৎস, জ্ঞানের মাধ্যম, সমস্ত সৃষ্টি জগতে মানুষের মর্যাদা ও সম্মান, জাগতিক উন্নতি সাধন ও অগ্রগতি লাভের পন্থা ইত্যাদি বিষয়ের কথা রয়েছে। এক কথায় কোরানে জ্ঞান অর্জনের সাধনায় সাফল্য ও তার ফলশ্রুতির প্রতিই আলোকপাত করা হয়েছে। তাই বলা যায়, কোরান চিরন্তনভাবে মানুষকে জ্ঞান অর্জনের অনুপ্রেরণা যোগায়।

৩। জ্ঞানের উৎস হিসেবে কোরান

মহাগ্রন্থ কোরান মানব মুক্তির দিশারী। প্রকৃত জ্ঞান দ্বারাই মানুষ সব অন্যায় ও অসুন্দর থেকে দূরে থাকতে পারে। তাই জ্ঞানের পরিপূর্ণ উৎসের সন্ধান দিয়ে আল্লাহ বলেছেন, কৃপাময় আল্লাহ তিনি কোরান শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে মত প্রকাশের স্বাধীনতা দিয়েছেন। জ্ঞান অসীম, তার পরিধি বিস্তৃত, সীমাহীন, জ্ঞানের বিষয়সমূহ অগণিত কিন্তু প্রতিটি জ্ঞানের বিষয়, তার শাখা প্রশাখা এবং প্রত্যেকটির মূল উপাদানের সন্ধান মিলে মহাগ্রন্থ আল কোরানে। জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চার প্রতি নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন, নিশ্চয়ই আসমান ও জমিনের সৃষ্টি এবং দিবা ও রাত্রির আবর্তনের মধ্যে জ্ঞানীদের জন্য নির্দশন রয়েছে, যারা দন্ডায়মান, শায়িত ও বসাবস্থায় আসমান ও জমীন সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা ও গবেষণা করে। (সুরা ইমরান শেষ রূকু) এই জ্ঞান ভান্ডার উন্মুক্ত করার মূল চাবিকাঠি হলো শিক্ষা।

কোরানের শাশ্বত চিরন্তনী সত্যবানী অবর্তীণ হবার পরে মুর্খতার ঘনান্ধকার কেটে গেলো। জ্ঞানের প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হলে বিশ্ববাসী লাভ করোল এক পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান, এক নতুন জীবন দর্শন। ঘুমন্ত মানুষ জ্ঞান সাধনার ও শিক্ষা বিস্তারের ব্রত গ্রহণ করলো।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৫

সঠিক উত্তরে পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১। কোন ধর্মগ্রন্থে বিশ্ব মানুষের প্রতি জ্ঞানানুশীলনের জন্য সরাসরি তাগিদ দেয়া হয়েছে?
- (ক) খৃষ্টান
- (খ) বৌদ্ধ
- (গ) বাইবেল
- (ঘ) ইসলাম

২। মানুষষের সত্ত্বা উপলব্ধি করতে সাহায্য করে–
- (ক) বিজ্ঞান
- (খ) জ্ঞান
- (গ) চিন্তাশক্তি
- (ঘ) কল্পনাশক্তি

৩। আল্লাহ আমাদের জন্য ফরয বা অবশ্যকরণীয় কাজের অন্তর্ভূক্তি করেছেন কোন্‌টি?
- (ক) জ্ঞানার্জন
- (খ) বুদ্ধি
- (গ) বিদ্যা
- (ঘ) চিন্তা

৪। কোরানের সর্ব প্রথম অবতীর্ণ কয়টি আয়াতে মানুষকে জ্ঞানচর্চার জন্য আহ্‌বান করেছেন?
- (ক) ৩টি
- (খ) ৪টি
- (গ) ৫টি
- (ঘ) ২টি

৫। ইসলাম কী?
- (ক) অপূর্ণ জীবন বিধান
- (খ) পূর্ণাঙ্গ জীবন
- (গ) জীবন বিধান
- (ঘ) আংশিক জীবন বিধান

পাঠ ১.৬ হাদিসের আলোকে শিক্ষা ও তার গুরুত্ব

এ পাঠ শেষে আপনি –

- হাদিসের শিক্ষা সম্পর্কিত উক্তির আলোকে আপনি ইসলামে শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

হযরত মুহাম্মদ (দঃ) বিশ্বগ্রন্থ কোরানের ধারক ও বাহক। এই গ্রন্থের নির্দেশে হজরত আজীবন তাঁর কথায় ও কাজে মানুষকে জ্ঞান অর্জনের জন্য আহবান জানিয়েছেন। তিনি যা কিছু বলেছেন বা যা করেছেন এবং যেসব বিষয়ের প্রতি তাঁর সমর্থন পাওয়া যায় সেগুলিকে হাদিস বলে। বেশ সংখ্যক হাদিস থেকে আমরা শিক্ষার গুরত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে হযরতের ধারণা ও মতবাদ জানতে পারি। এই পাঠে হাদিসের আলোকে শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

সকলের জন্য শিক্ষা

কোরানের অনুপ্রেরণা ও নির্দেশনা মানবজাতিকে জ্ঞান বিজ্ঞান সাধনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। হজরত (দঃ) ও তাঁর অসংখ্য বাণীতে মানুষের মনে জ্ঞান অন্বেষণের প্রবল স্পৃহা জাগিয়ে তুলেছিলেন। কোরানের নির্দেশ ছিল "তোমার সৃষ্টি কর্তার নামে পড়ো।" তারই প্রতিধ্বনি করে প্রতিটি মুসলমান নরনারী তথা মানব গোষ্ঠির উদ্দেশ্য হাদিসের অমূল্য আদেশ "তালায়াবুল এলমে ফরিদাতুন আলা কুল্লী মুসলেমীন ওয়া মুসলেমাতিন", অর্থাৎ জ্ঞানার্জন করা বা বিদ্যা শিক্ষা করা প্রতিটি মুসলমান নরনারীর জন্য ফরজ বা অবশ্য কর্বব্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

ইসলামের নবী ব্যতিত জ্ঞান অর্জনের জন্য বিশ্বমানবের উদ্দেশ্য এমন জোর তাগিদ আর কেউই দান করেননি এবং সকল নরনারীর জন্য শিক্ষা লাভ করাবে এমনিভাবে অবশ্য পালনীয় কর্তব্য হিসেবে নির্ধারণ করে দেননি।

চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে যে সময় আরবের বুকে গুটি কয়েক লোক লেখাপড়া জানত এবং সে ক্ষেত্রে হজরত (দঃ) নিরক্ষর ছিলেন সেই পরিবেশে জ্ঞান অর্জন সকলের জন্য বাধ্যতামূলক– এই বক্তব্যে তাঁর সর্বাধুনিক মনোভাবের পরিচয় পাওযা যায়। জ্ঞান অর্জন বা জ্ঞানচর্চা দ্বারাই মানুষ পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে পারে, ভালো ও উন্নত জীবন যাপন করতে পারে। সুতরাং দু'একজন লোকের জন্য নয় বরঞ্চ সকলের জন্য জ্ঞান অর্জন আবশ্যক। সার্বজনীন ও বাধ্যতামুলক শিক্ষার জন্য এই তাগিদ মানব কল্যাণব্রতী হজরত মুমমক্ষাদের (দঃ) পক্ষে অতি স্বাভাবিক বাণীই ছিল।

শিক্ষার প্রতি গুরত্ব

শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে হজরত আরও বক্তব্য রেখেছেন। যেমন– শিক্ষার দ্বারা আল্লাহর বান্দা মহত্বের চরমে উন্নতি হয়, উচ্চাসন প্রাপ্ত হয়, দুনিয়ার রাজন্যবর্গের সাহায্য লাভ করে। পরকালের পরম সুখের জন্য পূর্ণতা অর্জন করে। শিক্ষা মানুষকে কী নিষিদ্ধ আর কী নিষিদ্ধ নয় তা বুঝতে সাহায্য করে। বিদ্ধানের কালি শহীদের রক্তের চেয়েও পবিত্র।

যে জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে গৃহ ত্যাগ করে সে আল্লাহর পথে বিচরণ করে। বিদ্ধান ও জ্ঞানীগণ নবীগণের উত্তরাধীকারী। শুধু কথায় নয় তাঁর কাজের মাঝেও প্রতি মর্যাদা পরিস্ফুট হয়। বদরের যুদ্ধে তিনি শিক্ষিত বন্দীগণকে জিম্মি হিসেবে গণ্য না করে তাদের প্রত্যেককে অন্তত দশজন করে মদিনার অজ্ঞর জ্ঞানহীন মুসলমানকে শিক্ষাদান করার শর্তে মুক্তি দিয়েছিলেন এবং তাদের সম্মানীয় শিক্ষকের পদ মর্যাদায় ভূষিত করেছিলেন। তাঁর এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে হজরতের সাহাবাগণ জ্ঞানের অনুশীলন দ্বারা শিক্ষা ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে যেতে সমর্থ হয়েছিলেন।

আবার নিজে জ্ঞান লাভ করেলেই চলবে না। প্রতিবেশীকে শিক্ষা দেওয়া যে মুসলমানের কর্তব্য এ সম্পর্কেও হযরতের নির্দেশ রয়েছে; যেমন তিনি বলেছেন, সর্বাপেক্ষা উত্তম দান হলো কোনো মুসলমান ব্যক্তি জ্ঞান শিক্ষা করবে; অতঃপর তা তার অপর ভাইকে শিক্ষা দেবে।

জ্ঞানান্বেষণে যে কঠোর অধ্যবসায়, নিরলস সাধনা, অবিরাম প্রচেষ্টা অক্লান্ত শ্রম ধৈর্য ও ত্যাগ তিতীক্ষার প্রয়োজন, সে কথাও তিনি বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তৎকালে সুদূর চীন দেশে ছিল জ্ঞান বিজ্ঞানে অতি উন্নত ও সমুদ্ধ দেশ। তাই তিনি বলেছেন, জ্ঞানান্বেষণে কর যদি তা চীন দেশেই হউক না কেন।

হাদিসে জ্ঞান অন্বেষণের অনুপ্রেরণা

জ্ঞান অন্বেষণের প্রতি হজরতের (দঃ) যেভাবে তাগিদ করেছেন, তা তাঁর সাহাবায়ে কেরামদের ওপরও বেশ প্রভাব বিস্তার করেছিল। জ্ঞান অর্জন, বিদ্যা শিক্ষা ও জ্ঞান সাধনায় তাঁরা বিশেষভাবে অনুপ্রাণীত হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে মায়াজ ইবনে জাবাল, আব্দুলাহ ইবনে মাসউদ, হজরত আলী, হযরত আনাস প্রমুখ প্রধান। এঁরা কোরানের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও মহানবীর (দঃ) হাদীস সংরক্ষণে জীবন অতিবাহিত করেন। তাঁদের সমস্ত সাহাবায়ে কোরামই এর মহান দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৬

সঠিক উত্তরে পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১। বিশ্বগ্রন্থ কোরানের ধারক ও বাহক–
- (ক) হযরত মুহাম্মদ (দঃ)
- (খ) হযরত মুসা (আঃ)
- (গ) হযরত ঈসা (আঃ)
- (ঘ) হযরত ওমর (আঃ)

২। কোন গ্রন্থের নির্দেশে হযরত মুহাম্মদ (দঃ) তাঁর কথায়ও কাজে মানুষকে জ্ঞান অর্জনের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন?
- (ক) কোরান
- (খ) বাইবেল
- (গ) গীতা
- (ঘ) হিন্দু

৩। আরবের বুকে গুটি কয়েক লোক লেখাপড়া জানত কত সালে?
- (ক) ১৪০০ বৎসর পূর্বে
- (খ) ১২০ বৎসর পূর্বে
- (গ) ১৩০০ বৎসর পূর্বে
- (ঘ) ১৫০০ বৎসর পূর্বে

৪। শহীদের রক্তের চেয়েও পবিত্র–
- (ক) বিদ্ধানের কালি
- (খ) মূর্খ্যের কালি
- (গ) পীরের কালি
- (ঘ) আউলিয়ার কালি

৫। হযরত মুহাম্মদ (দঃ) নির্দেশ ছিল–
- (ক) প্রতিবেশীকে শিক্ষা দেয়া
- (খ) গরীবদের শিক্ষা দেয়া
- (গ) আত্নীয়দের শিক্ষা দেয়া
- (ঘ) অনাত্নীয়দের শিক্ষা দেয়া

চছড়ান্ত মূল্যায়ন – ইউনিট ১

এই ইউনিট পাঠ করে আপনি বিষয়বস্তু কতটুকু বুঝতে পেরেছেন তা মূল্যায়নের জন্য নিম্নের প্রশ্নগুলির উত্তর লিখুন।

সংক্ষিপ্ত ও রচনা মূলক প্রশ্ন

১। মানব জাতির প্রতি আল্লাহর প্রথম আদেশ কী ছিল?

২। কোরান মানুষকে জ্ঞান অর্জনের জন্য কী অনুপ্রেরণা দিয়েছে?

৩। কোন হাদিসে শিক্ষা সম্পর্কে হজরতের সার্বজনীন মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়?

৪। হাদিসের উক্তির আলোকে শিক্ষার গুরুত্ব নির্ণয় করুন।

৫। কোরানকে জ্ঞানের উৎস বলা হয় কেন?

৬। সার্বজনীন শিক্ষা সম্পর্কে হজরত মুহম্মদের (দঃ) বক্তব্য কী?
৭। হজরত মুহম্মদের (দঃ) সাহাবীগণ কীভাবে জ্ঞান অন্বেষণে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন?
৮। দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় উচ্চ শিক্ষা বিদ্যালয়গুলো কত রকম ছিল ও কী কী?
৯। দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় উচ্চ শিক্ষাদানের জন্য কি ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ছিল?
১০। কিভাবে বারতীয় 'পড়ো-সর্দার' প্রথা ইংল্যান্ডে কাজে লাগানো হয়েছিল? এ পদ্ধতি কি নামে পরিচিত ছিল?
১১। দেশী শিক্ষার মাধ্যমে জাতীয় শিক্ষার বুনিয়াদ রচনা সম্ভব ছিল কিনা—এ সম্পর্কে মন্তব্য করুন।
১২। বাংলা ও বিহার প্রদেশের শিক্ষা কমিশনার হিসাবে উইলিয়াম এ্যাডাম কয়টি রিপোর্ট পেশ করেন ও কী কী? বর্ণনা করুন।
১৩। উইলিয়াম এ্যাডামের প্রথম রিপোর্টে বাংলা ও বিহারে মোট লোকসংখ্যা ও বিদ্যালয়ের সংখ্যা কত ছিল? সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করুন।
১৪। উইলিয়াম এ্যাডম তাঁর তৃতীয় রিপোর্টে বাংলা ও বিহারের কোন কোন পাঁচটি জেলার পরিসংখ্যান পেশ করেন?
১৫। দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কারের লক্ষ্যে এ্যাডামের সুপারিশসমূহ ব্যক্ত করুন। সুপারিশগুলো বাস্তবায়িত না হওয়ার ফলাফল কী হয়েছিল আলোচনা করুন।
১৬। ইতিহাস বলতে কী বোঝায়?
১৭। শিক্ষার ইতিহাস কাকে বলে?
১৮। ইতিহাস ও শিক্ষার ইতিহাসের মধ্যে পার্থক্য কী?
১৯। শিক্ষার ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করুন।
২০। শিক্ষার ইতিহাসের জ্ঞান বর্তমান শিক্ষা উন্নয়ন কিভাবে সাহায্য করে?
২১। হাদিস কাকে বলে?
২২। কোন কোন হাদিসে শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে?
২৩। সার্বজনীন শিক্ষা সম্পর্কে হজরত মুহম্মদ (দঃ) বক্তব্য কী?

উত্তরমালা - ইউনিট ১

পাঠ ১.১
১। ঘ ২। ঘ ৩। ক ৪। খ ৫। ঘ ৬। ঘ ৭। গ ৮। ক

পাঠ ১.২
১। ক ২। গ ৩। ক ৪। গ ৫। গ ৬। গ ৭। খ ৮। ঘ ৯। ক ১০। গ

পাঠ ১.৩
১। ঘ ২। ঘ ৩। ক ৪। ক ৫। খ

পাঠ ১.৪
১। ক ২। ঘ ৩। ক ৪। খ. ৫। ঘ

পাঠ ১.৫
১। ঘ ২। খ ৩। ক ৪। গ ৫। গ

পাঠ ১.৬
১। ক ২। ক ৩। ক ৪। ক ৫। ক